একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158

**An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)**

# Narendranath Mitra's novel 'Durbhashini': A history of the heart-searching of an independent-minded woman

# নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ‘দূরভাষিনী’ উপন্যাস: স্বাধীনচেতা নারীর হৃদয়চর্চার ইতিহাস

Name of the Author: **Dr. Paritosh Roy**

Affiliation: **Assistant Professor, Mariyam Ajmal Womens’ College of Science And Technology, Hojai, Assam, India**

**Abstract:**‘Durovashini’ novel wrote by Narendranath Mitra. It explores the working women. They are coming from middle class and struggle in workplace as telephone operators. These women initially begin working to support their financially constrained families, but gradually become overwhelmed by the pressures of a demanding and unfamiliar professional life. Their daily routine turns monotonous and mechanical, leading to emotional exhaustion. Although they possess natural desires for love, affection and personal freedom, such feelings are suppressed due to workplace stress and restrictive environments, resulting in a deep sense of emptiness.

BinaguhaThakurta and Kamala, in particular, seek liberation from traditional family restrictions and social norms, embracing a more modern and economically independent identity. However, despite achieving financial independence, they experience inner dissatisfaction and emotional deprivation. Thus, ‘Duravashini’ is not merely a story about telephone operators but a profound commentary on the loneliness, struggles, and unfulfilled desires of working women in a rapidly modernizing society.

**Keywords:** Duravashini, Narendranath Mitra, working women, middle-class life, economic struggle, gender roles, independent identity.

# নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দূরভাষিনী' উপন্যাস: স্বাধীনচেতা নারীর হৃদয়চর্চার ইতিহাস

ড. পরিতোষ রায়

নারী ও পুরুষ উভয় মানুষ । উভয়ই সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । কিন্তু নারীকে তার আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার মর্যাদা সম্মান দিতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বা পৌরুষ মানসিকতার সমাজ ব্যবস্থা নানাভাবে কণ্ঠরোধ করে। যেকোনো সমাজে ই পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা , আচার-আচরণ নারীকে অপমান করে। নারী পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টি করে । যা সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে বাধা দেয়। তাই পুরুষতন্ত্র হলো এমন একটি সামাজিক তত্ত্ব বা মতবাদ যেখানে বৈষম্যমূলক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় । সেখানে পুরুষ যেমন পুরুষতন্ত্রের শিকার হতে পারে তেমনি নারীও সেই ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে । অর্থাৎ পুরুষতন্ত্র হলো একটি দমিয়ে রাখা বা শাসিয়ে রাখা বঞ্চিত করে রাখা মানসিকতা । যা পুরুষের মধ্যেও বর্তমান আবার নারীর মধ্যেও সমান ভাবে বিদ্যমান । তসলিমা নাসরিনের মতে "পুরুষ ভালো, পুরুষতন্ত্র মন্দ। এই হল সোজা কথা, সাফ কথা এবং সবার কথা । ... এটিকে টিকিয়ে রাখছে? হাওয়া? না হাওয়া না ? সত্যি বলতে গেলে পুরুষ? নারীও? নারী হলেই যে নারীবাদী হবে তা নয় । আমি অনেক পুরুষকে দেখেছি যারা অনেক নারীবাদীর চেয়েও বেশি নারীবাদী । আবার অনেক নারীবাদীর দেখা আমি পেয়েছি , যারা প্রচন্ডভাবে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক"।[১]

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে নারী কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার প্রসার ঘটে । নারী মুক্তি নারী স্বাধীনতা ও নারীর গণতান্ত্রিক অধিকারের ভাবনা গুলির উদ্ভব হয় ।নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা সাহিত্যে যে নরনারীর কথা বলেছেন , তারা সেকালে নারী পুরুষ নন । তারা এ কালের নারী পুরুষ । চিন্তা চেতনায় অনেকটা এগিয়ে, শিক্ষিত, কর্মে সাহসি। তাই নতুন ভাবনা, নতুন চিন্তার প্রেক্ষাপটে নরেন্দ্রনাথ তাদের নির্মাণ করেছেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কথা সাহিত্যে বিশেষত নারীকে ন্দ্রিক উপন্যাসগুলিতে নারীপুরুষত ন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সেখানে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের (১৯১৬-১৯৭৫) উপন্যাসে নারী চরিত্র গুলি দৃঢ় চরিত্রে আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিংশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বীনাগুহ ঠাকুরতা ও কমলাকে দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন নানাভাবে।

ভারত পথিকের রাজা রামমোহন ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা উদ্বুদ্ধ হয়ে শাস্ত্রীয় কুপমন্ডুকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। যুক্তিবাদ মন ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা নারী মুক্তির কথা বলে গেছেন। সেই যুক্তিবাদী চিন্তা ধারার পথে হেটে ছিলেন আরেক সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর । তিনি রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করেছেন ।সেই ধারাবাহিকতায় চেনামহলের নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে বিদ্যাসাগরের ভাবশিষ্য বলা যায় । তিনি মূলত বিংশ শতকের লেখক । বিংশ শতকে নারী কেন্দ্রিক চিন্তাভাবনার আমূল পরিবর্তন হয়েছে । জ্ঞানের প্রসার ঘটেছে । বিশেষত দেশভাগকে কেন্দ্র করে নর নারীর প্রেম ও জীবন সংগ্রামের মাত্রা পাল্টে গেছে । এই দেশভাগের পটভূমিতে রচনা করেছেন "দূরভাষিনী" উপন্যাসটি। বিদ্যাসাগরীয় চিন্তাচেতনার আলোয় উত্থানপতনময় জীবনসংগ্রামের পটভূমিতে তুলে এনেছেন দুটি

নারী চরিত্রকে – বীনা গুহ ঠাকুরতা ও কমলাকে । সমালোচকের মতে নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "প্রায় প্রতিটি গল্পে দেখি একজন নারী চাকরি করছে সংসারকে বাঁচানোর জন্য । যে নারী ঘর ছেড়ে বাইরে জগতে পা ফেলে জীবিকার সন্ধানে যাত্রা করেছে, এটা বেশি দেখা যেত দেশবিভাগের পর"।[২]

নরেন্দ্রনাথ মিত্র দেশ বিভাগের পটভূমিকায় তাদের তুলে ধরলেও দেশ বিভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ক্ষতবিক্ষত রূপকে তুলে আনেননি । তিনি দেশ বিভাগের পরোক্ষ প্রভাবে নিষ্পেষিত হওয়া নারীর অবস্থানকে তুলে ধরতে গিয়ে স্বাধীনচেতা নারীর প্রতিবাদকে লিপিবদ্ধ করেছেন 'দূরভাষিনী" উপন্যাসে ।বীনা গুহঠাকুরতাকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছেন – "তুমিই লিখ আমার কাহিনি। আমি যা শুধু হয়েছি তাই নয়, যা শুধু করেছি তা নয়, জীবন ভর যা আমি করতে চেয়েছি, হতে চেয়েছি, যা আমাকে হতে হবে, তার সব কথাই যেন তোমার লেখা, যেন আমাদের কথায় ভরে উঠিয়ে নির্মল"।[৩]

নিজের ক্ষোভ নিজে প্রকাশ করতে না পেরে এক অবলম্বনকে খুজে প্রকাশ করতে চেয়েছেন । আসলেই নারীর জীবন যন্ত্রণা ও তার প্রগতির কাহিনী নির্ভর বহুমাত্রিক ইতিকথা পাওয়া যায় নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কথা সাহিত্যে । এখানে শুধু বীনাগুহ ঠাকুরতা কী হতে চেয়েছে , কী হয়েছে? শুধু তারই কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে বলেনি। বলেছে 'আমাদের' অর্থাৎ বহুবচনে তার মত নারী জাতির জীবন যন্ত্রণার কথা লিপিবদ্ধ করতে বলেছে । বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলি একই পরিধির বেষ্টনীতে প্রগতিশীলতার পরিচয় দেয়।

প্রগতি শব্দের অর্থ অগ্রগতি । প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন অর্থাৎ প্রগতির সঙ্গে যুক্ত শিল্প , সাহিত্যওজীবনসংগ্রামের অনুশীলন। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই প্রগতিশীলতার পরিচয় দেন । আমাদের সামাজিক কাঠামোতে নারীর শ্রদ্ধা আজও অবাধ সার্থকতা খুঁজে পায়নি। আজ অবধি তারা সার্থকতা খুঁজে পায় জননী বা কন্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্র কিংবা রবীন্দ্রনাথ -শরৎচন্দ্রের নারীরা অন্তর্নিহিত সামাজিক জটিলতা র সংস্কারে আবদ্ধ থেকে সেই ভাববৃত থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'চেনামহল' উপন্যাসে যেমন একান্নবর্তী পরিবারের চেনামহলের মধ্যে অচেনা মানুষজন বাস করে , তেমনি 'দূরভাষিনী' উপন্যাসে চেনা মানুষজন বিশেষ নারীরা অচেনা জীবনের বেশ ধারণ করে ।চেনামহলে যেখানে অবনীমোহন বৈদ্যনাথরা পুরুষ হয়েও সংসার সামলাতে টালমাটাল সেখানে তাদের স্ত্রী -ননদদের মনোমালিন্য স্বাভাবিক । সেই মনোমালিন্যে বাদবিবাদ ছাড়া স্ত্রী চরিত্ররা বা নারীরা অতি সহজে সংসারের বাইরে পা রাখতে পারেনা । এইজন্য তারা ঘরে বন্দি পরাধীন নারীর মতো একে অপরের প্রতি হিংসায় মত্ত হয়ে ওঠে । করবি এবং রমারা বাইরে বেরিয়ে এসে স্বাধীনচেতার পরিচয় দিলেও কোথাও যেন একটা সংকোচের মধ্যে আটকে থাকে । অপরদিকে "দূরভাষিনী" উপন্যাসটি নারীহৃদয়ের জীবন যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। স্বাধীনচেতনা সম্পন্ন নারীরা এখানে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

"দূরভাষিনী (আশ্বিন, ১৩৫৯) টেলিফোনে কাজ করা মেয়েদের জীবন কাহিনী ও হৃদয় চর্চার ইতিহাস । কিন্তু ইহাদের যে সমস্যা তাহা যে কোন অফিসে চাকরি করা তরুণী সম্বন্ধে প্রযোজ্য টেলিফোনের সঙ্গে ইহার বিশেষ কোনো নাই । মধ্যবিত্ত সংসারের দারিদ্র্যের পীড়নে অকস্মাৎ অনভ্যস্ত জীবনযাত্রার জোয়ালে বাধা এই

মেয়েদের বঞ্চিত বুভুক্ষুদের হৃদয়ে ভালোবাসার জন্য একটা প্রবল আকুতি জাগিয়া ওঠে । কিন্তু যান্ত্রিক কর্তব্য পালনের ভেতর দিয়া তাহাদের স্বভাব সৌকুমার্যও আবেগের সরলতা শুষ্ক হইয়া যায় ।ইহাই তাহাদের জীবনের ট্রাজেডি" ।[৪]

'দূরভাষিনী' টেলিফোনকর্মী মেয়েদের নিয়ে লেখা একটি নো ভেলেট। আসলে তা পারিবারিক নিষেধ ও সংস্কার শৃঙ্খলা মুক্ত আখ্যান। আধুনিক দ্রুত জীবনে অভ্যস্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দৃপ্ত কর্মী নারীদের কাহি নি। এইসব মেয়েদের এইসব মেয়ে রা দারিদ্র্যপীড়িত মধ্যবিত্ত জীবন থেকে উঠে এসেছে। প্রথমটায় পারিবারিক অনটন মেটানোর দায়িত্ব নিয়ে তারা এক নতুন কর্মের রুটিনে বাঁধা পড়ে । তার ফলে যান্ত্রিক কর্তব্য পালনে তারা হাপিয়ে ওঠে। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রের চাহিদা পূরণের মধ্যে এদের মনে জেগে উঠে বঞ্চিত নারী জীবনের ক্ষুধার আকুতি। কিন্তু তার পূরণের কোন নেই । এর ফলে নিজেদের মেয়ে ও পুরুষ কর্মীদের সঙ্গে সম্পর্কের জটিলতা দেখা দেয়।বীনা, মৃন্ময়, কমলা এই জটিলতার শিকার হয়"[৫]

উপন্যাসটি জনৈক সাংবাদিকের জবানিতে রচিত ও বা বর্ণিত । যিনি মৃন্ময় নন্দীর অফিসে র সহকর্মী। মৃন্ময়নন্দী সুপ্রভাত দৈনিক পত্রিকার জুনিয়র রিপোর্টার । তার সঙ্গে টেলিফোন কর্মী বীনাগুহ ঠাকুরতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মৃন্ময়ের টেলিফোন প্রিয়তার কারণ এটাই । একথা জানার পর সাংবাদিকের ইচ্ছে হয় বীনার সঙ্গে পরিচয় করার। মৃন্ময়ের হাত ধরে সাংবাদিকের পরিচয় হয় বীনার।মৃন্ময় আর বীনাদের গ্রাম পাশাপাশি। আজ তারা দেশভাগ-দাঙ্গা কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে কলকাতাতে এসে উঠেছে ভাড়া বাড়িতে।

তারপর গিরীনবাবুদের জন্য ১৩/৩ বাঞ্ছারাম অক্র র লেনের বাসাবাড়ি ঠিক করে দেয় মৃন্ময় । বীনার প্রাইভেট মেট্রিক পরীক্ষার ব্যাপারেও সাহায্য করেছে মৃন্ময় । আবার পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে বীনা যে চাকুরি পেয়েছে তাও মৃন্ময়ের চেষ্টায় । তারপর মৃন্ময় ও বীনার ঘনিষ্ঠতা শুরু হয় । একসঙ্গে সাহেবপাড়া সিনেমা হাউসে ইংরেজি ছবি দেখা দুজনের রেস্তোরায় খাওয়া-দাওয়া পার্কে পাশাপাশি বসে গল্প করা । তাদের দুজনের সম্পর্কের কথা গিরিন বাবুর কানে আসে । তিনি জাতপাতের কথা ভুলে বীনার সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেয় মৃন্ময়কে। মৃন্ময়দের নিচু বংশের চিন্তা নাই নিজের সংসার কিভাবে চলবে সেই চিন্তা ই প্রবল।মৃন্ময় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

কন্যাগ্রস্ত পিতার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, পুরুষার্থ আহত হয়। এই কারণে বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। আসলে অনেক দিনের কুসংস্কা রাচ্ছন্ন মন নতুন কিছু কি অতি সহজে মেনে নিতে পারে না । পুরাতন ঐতিহ্য সংস্কারের প্রভাবকে মন থেকেঅতি সহজে মুছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। যুক্তিও সেখানে শুধু তর্কের খাতিরে এগিয়ে যায় মাত্র । সেই পুরাতন ঐতিহ্য আর সংস্কার যেন রক্ত মাংসের মধ্যে মিশে আছে।

নারীর সৌন্দর্যের ওপরে পুরুষের পক্ষপাত চিরকা লের বীনার যা চেহারা আর যা স্বাস্থ্য তাতে মৃন্ময়কে খুব দোষ দেওয়া যায় না । তাহলে তাহলে কী নারীর দেহসৌন্দর্যটাই আসল তার ভালোবাসার কোন মূল্য নাই পুরুষের কাছে। নারী কী কেবল কামনার বস্তু ভালবাসার মুকুট তাকে কি পরিয়ে দিতে পারেনা মৃন্ময়ের মত পুরুষেরা। এইরকম পুরুষদের সামগ্রিক চেষ্টা য় নারীরা অবহেলিত নারীতে পরিণত হয় । অর্থাৎ কেউ নারী

হয়ে জন্মায় না বরং সমাজ নারী তৈরি করে । পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পরিপূর্ণ নারীকে পরিপূর্ণ মানুষ রূপে বসবাস করতে দেয় না। তাকে গড়ে তোলে অবলা অর্ধাঙ্গিনীরূপে ।ফলে তাদের অন্তর বা ইরে দাসে পরিণত হয়। তাদের অধিকার স্বাধীনতা ভোগ করতে গেলেই পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। চলতে ফিরতে নানা ভাবে তারা নির্যাতনের শিকার হয়। উপন্যাসে মৃন্ময় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি হয়ে বীনা গুহঠাকুরতাকে ভোগের বস্তু বানাতে চেয়েছে, তাদের যে যথার্থ সম্মান মর্যাদা অধিকার স্বাধীনতা রয়েছে সেটা সে মনে করতে চায় না। তাদের মত মানুষেরা ভুলে যায় –

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর/অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"।[৬]

কিন্তু যুগ বিবর্তনের পথ ধরে আধুনিক শিক্ষিত নারীরা অনেক স্বনির্ভর হয়েছে । দৃঢ়ভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিতে উদ্যোগী হয়েছে। সেই রকমই স্বাধীন শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের গল্প উপন্যাসে । তবে তিনি নারীকে আধুনিক দৃষ্টিতে সমাজের গঠনমূলক চিন্তাভাবনায় তুলে এনেছেন । নারী কিংবা পুরুষকে কোন একজনকে অন্য কো নো জগতের মানুষ বলে তুলে ধরেননি । যার প্রচেষ্টাতেই সমাজ সংসারে সুসম্পর্কের বন্ধন অটুট থাকে। নরেন্দ্রনাথ মিত্র সেই সম্পর্ক তুলে ধরতে গিয়ে নরনারীর প্রেমকে বেছে নিয়েছেন । সেখানে দেখা গিয়েছে কোনো নারী হয়তো চাকরী করছে, সংসার বাচানোর তাগিদে আর কেউ হয়তো নারী হয়ে সেই সংসারে ই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করছে । যার পরিচয় পাওয়া যায় – 'অক্ষরে অক্ষরে', 'দূরভাষিনী', 'অবতারণিকা', 'সূর্যসাক্ষী' কিংবা 'চেনামহলের' মতো গল্প উপন্যাসে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র বিংশ শতকের কথা সাহিত্যিক । বিংশ শতকের চিন্তা চেতনায় সৃষ্টি করেছেন নারী চরিত্র। বীনা গুহঠাকুরতা 'দূরভাষিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। তার সংগ্রাম ও ক্রমবিকাশই উপন্যাসের মূল প্রেক্ষাপট। বীনা ব্যর্থ প্রেমের জ্বালায় মাঝে মাঝে আশ্রয় নেয় তার অসুস্থ বান্ধবী কমলার কাছে । বীনা নিজে রোজগার করে সে বেঁচে থাকতে চায় । যে কমলা একসময় বীনার সঙ্গে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে কাজ করত এখন সে থাইসিসে ভুগত। এই কমলাদের পরিবারও বীনাদের মত দারিদ্রগ্রস্থ, টাকার অভাবে কমলার ওষুধ কেনা হয় না । বীনা টাকা ধার দেয় , শোধ দিতে পারার অনিশ্চয়তা জেনেও। বীনা সভা-সমিতি নিয়ে বেশ আছে। কমলাকে সাহায্য করার জন্য জল সার ব্যবস্থা করে। অন্যদিকে মৃন্ময় শহরের সুন্দরী মেয়ে বেছে বেছে বেড়াচ্ছে বিয়ে করার জন্য ।তার বেশি মাইনের জন্য আরেকটি ভালো চাকরি জুটেছে । ভবানীপুরের কীর্তিময় গুহের সুন্দরী শিক্ষিতা সুরুচিসম্পন্না সুস্মিতাকে মৃন্ময়ের পছন্দ হয় । মৃন্ময় বউ সম্পর্কে খুব খুতখুতে। তাই বীনার মতো রূপহীনা মেয়ের সঙ্গে মৃন্ময়ের ঘনিষ্ঠতা বিস্ময়কর। এতে সে মৃন্ময় কি কেবল পরোপকার প্রবৃত্তিতেই বীনাকে স্নেহ করত নাকি রূপহীনা নারীর সংস্পর্শে এসে তার পুরুষত্বকে চরিতার্থ করতে চেয়েছে।

মৃন্ময়ের প্রত্যাখ্যান বীনাকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে । তাই সে তার পিতার মুখের উপর নিজের রোজগারের গর্বপ্রকাশ করে বলতে পারে –"আমার রোজগার করা টাকা আমি যাকে ইচ্ছা তা কে দেব। তাতে কেউ যেন কোন কথা বলতে না আসে"।[৭] নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের যেন প্রাইভেসি বলে কিছু নেই । কিছুই আর

আড়ালে আবডালে থাকে না। 'সব রকম পর্দা আমরা তুলে ফেলে বেঁচেছি '! সেখানে দারিদ্র গ্রাম্য সংসারকে ছারখার করেও প্রেমের সম্পর্কের কথা গোপন থাকে না।

গিরিনবাবুর গোটা পরিবার কলকাতায় চলে এসেছে । তার ও সেরকম উপার্জন ছিল না । মৃন্ময়ের চেষ্টাতেবীনাদের ঘর জোটে অর্থের যোগান হয় । গিরীন্দ্র গুহঠাকুরতা পুরনো বাড়িতে থাকতে পারলেন না কারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট। যেখানে এখানে প্রত্যক্ষ দাঙ্গা বা হিংসার কথা বলা হয়নি ঠিকই কিন্তু তার প্রভাবকে তুলে আনা হয়েছে স্পষ্টভাবে । ঐতিহাসিকদের মতে "পূর্ববঙ্গ ছেড়ে উদ্বাস্তু স্রোতের একমাত্র কারণ একমাত্র দাঙ্গা নয় , অবশ্য ১৯৪৯-৫০ এর শীতকালে পূর্ব বঙ্গের কোন কোন জেলায় হিন্দুদের উপর প্রচন্ড আঘাত নেমে এসেছিল। ... বিশেষত মধ্যবিত্তের ক্ষেত্রে ছিল অন্যরকম। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা হ্রাস, ছোটখাটো ব্যাপারে বিব্রত হওয়া। পুরনো আমলের সামাজিক সম্মান রাখা যাবে না। এই ধরনের চিন্তা".[৮]

তবে বঙ্গভঙ্গ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির ভার হিন্দুদের পশ্চিমবঙ্গ আকর্ষণ একটা পরিণত হয় । হিন্দু মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের একটা বড় অংশ আর পূর্ব পাকিস্তানের থাকতে চায় না । তারা নিজেরা সেখানে নিঃসঙ্গতা ও নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব রক্ষা ছেড়ে কলকাতাকে স্থায়ী ও নিরাপত্তার স্থান হিসেবে নির্বাচন করে। মৃন্ময়ের সহযোগিতায় বীনা একটি টেলিফোন অফিসে চাকরি জোটায়। এই সময় মেয়েরা বাধ্য হয়েছে জীবিকা উপার্জনের পথে নেমেছিল। সদ্য স্বাধীন দেশের নানা সমস্যায় পীড়িত হয়ে মেয়েরা ছেলেদের মতো বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হল । 'অবতরনিকা' গল্পে যেমন আরতিকে সেলসম্যান হিসেবে দেখা গেল তেমনি 'দূরভাষিনী' গল্পে বীনা-কমলাকে টেলিফোন অপারেটর হিসেবে দেখা গেল। এই কর্মসূত্রে তাদেরকে ভেদ করে এগিয়ে যেতে হল। সংগ্রাম করে নিজের প্রাপ্যকে বুঝিয়ে নিতে হল । কিন্তু বীনাকে দেখা গেল শুধু প্রতিবাদী হয়ে সংগ্রাম করে যেতে আর কমলাকে পুরুষতন্ত্রের কাঠামোয় নিজেকে নিষ্পেষিত হতে।

মৃন্ময় পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি। সে বীনাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে । বিবাহ করতে চা য়নি। তার কারণ তার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। বীনা রূপযৌবন সেরকম ছিল না বলে তাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করে নিতে তার দ্বিধা হয়। তাছাড়া তার বিবাহিত নারী চাকরি করবে তা মেনে নিতে পারছে না । বিংশ শতকে একজন শিক্ষিত পুরুষ হয়েও মৃন্ময় সেই সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই বীনা গুহঠাকুরতা মৃন্ময়ের করুণার পাত্রী হতে চা য়নি। সে স্বাধীনচেতা শিক্ষিতা নারী । সেই পরাধীনতা মেনে নেয়নি । স্বাবলম্বী প্রত্যাখ্যাত পুরুষকে বরং সে নি চ ভাবে। মৃন্ময়কে ঘৃণা করে, সে নীচ প্রকৃতির জন্যই। মৃন্ময় নন্দী অন্যখানে বিয়ে করতেও দ্বিধান্বিত বা ভয় পাচ্ছে। কারণ বীনা যদি তার বিবাহিত অতীত ঘটনা প্রবাহ দিয়ে প্রবাহিত করে তাহলে দাম্পত্য জীবন অস্বস্তিতে ভরে যাবে । তাই মৃন্ময়ের বলা "দেখো নরনারী পুরুষের সবসময় কার ঘনিষ্ঠ তাই বিয়েতে গিয়ে পৌছায় না। তা সম্ভবও নয়"।[৯] কথার তীব্র প্রতিবাদ করে।

আসলে বীণার কাছে মৃন্ময় সীমার মাত্রা অতিক্রম করে ফেলে ছে। সে কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠে "এত স্পর্ধা তোমার এত সাহস । টাকা দিয়ে তুমি আমার ক্ষতিপূরণ করবে ? টাকার এত জোর হয়েছে তোমার যেসব ক্ষতি তুমি তাতে পূরণ করতে চাও? নির্লজ্জ বদমাশ কোথাকার?"[১০]

একজন নারীর পক্ষে একজন পুরুষের কাছে এ অপমান চূড়ান্ত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নির্লজ্জতা আর নিজ প্রবৃদ্ধির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে মৃন্ময় নন্দী। এখানেই সে থেমে থাকে না বীনাকে কথার মায়াজালে ভোলাতে না পেরে সে তার বাবা গিরিন বাবুর অসহায়তার সুযোগ নিয়ে টাকা ধার দিতে চা য়। ভালো চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয় । এই শ্রেণীর মানুষ নারীকে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনা । সুযোগ পেলে নারীর উপর চড়াও হতে দ্বিধা করে না । তাই মৃন্ময়কে বলতে শুনি "সব মিলিয়ে গোটা দশ-বারো চুমু দিয়ে কি ছু কাউকে মোটেই আটকানো যায় না "।[১১] এটাই পুরুষের নারীকেন্দ্রিক লোলুপ মানসিকতা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় তাকে সেবাদাসী হিসেবে ভাবে এবং দেখতে চায়। বীনাও মৃন্ময়ের সেই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সঙ্গত কারণে তার প্রধান প্রতিপত্তি হয়ে মৃন্ময়ের পৌরুষশাসিত মানসিকতা। যা তাকে অনবরত ভাবায় । সেই ভাবনার সূত্র ধরে ই শিল্পীমনস্ক স্বাধীন মুক্ত মানসিকতার ব্যক্তিপুরুষ বিমলকে খুঁজে নিজের হাতিয়ার বানাতে থাকে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র শুধু গল্প বানান না , চরিত্র বানান । তিনি চিত্রশিল্পী ।'দূরভাসিনী' উপন্যাসে চরিত্রই মু খ্য স্থান অধিকার করেছে। এক অভাবি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ের চাকরির কেন্দ্র করে জীবন সংগ্রামের গল্প সৃষ্টি করেছেন। চাকরিকে তার পরিবার কোন চোখে দেখে , তার প্রেমিকের সঙ্গে মানসিক টানা পোড়েনেই নারীর স্বাতন্ত্র্য, ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণকে আবর্তিত করেছেন এই আখ্যানে।

উপন্যাসটিতে কমলা বীনারই সহকর্মী । স্বামীর সংসার বাঁচানোর তাগিদে কুমারী সেজে টেলিফোন অপারেটর এর কাজ নিয়েছিল। কারণ সেই সময় বিবাহিত মেয়েরা ওই চাকরির আবেদন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। কুমারী সেজে চাকরি করতে যাওয়া নিয়েই সংসারে কলহ বাধে । সিন্দুর পরে যেতে হবে এই অযৌক্তিক আদেশ কমলা মানতে পারে না। সামাজিক বন্ধনের এই অনুশাসনকে মেনে নিলে কর্মে টিকে থাকা মুস্কিল হয়ে পড়বে। এই ভাবনায় সামাজিক অনুশাসনের বন্ধনের চিহ্ন এড়িয়ে গেলে, বিনয়বলেছে – "বিবাহিত জীবনের পক্ষে এ একটা ঘোর অনিয়ম। তুমি ও চাকরি ছেড়ে দাও। ... ঘরের বউ ঘরে থাক। ... I want a woman - womanly woman."[১২]

বিনয়েরও নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় একই। সব সময় ভোগ্য পণ্য হিসেবেই দেখে আ সছে। নারীকে ভোগের বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেনা। নারীর খোলামেলা পোষাক ও মুক্তচিন্তায় আচার-আচরণকে তারা প্রশ্রয় দিতে চায় না। কারণ পুরুষের নারীকেন্দ্রিক লোলুপ মানসিকতা প্রধান হয়ে উঠে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র কমলা ও বীনা এই দুই মেয়ের চরিত্রকে সামনে রেখে মধ্যবিত্ত পরিবারের চাকরি করা মেয়েদের সমস্যাগুলিকে নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন । কমলার কর্মক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে প্রবল অশান্তি দেখা দেয়। নাইট ডিউটিতেও স্বামীর আপত্তি। শেষে দৈহিক তাড়না পর্যন্ত গড়ালে কমলা পিতৃগৃহে চলে আসে।

ম্যাট্রিক পড়তে পড়তে কমলার বিয়ে হয় বিনয় বাড়ুর্যের সঙ্গে। সে মার্চেন্ট অফিসে কাজ করে। অফিসে ছাটাই হলে কমলাই দায়ী হয়। এইজন্য একদিকে শাশুড়ির বঞ্চনা ও স্বামীর কর্মহীনতায় সে চাকরি খোঁজার চেষ্টা করে। পেয়ে যায় টেলিফোন অফিসের চাকরি। সেখানে একটাই বাধা তাকে অবিবাহিত হতে হবে।

সংসার বাঁচানোর সংগ্রামে কমলার সিঁদুর মুছে ফেলা চিরাচরিত প্রথার বাহিরে বেরিয়ে আসার বড় পদক্ষেপ। নিজের মতো হওয়া বা হয়ে ওঠার জন্য বিরোধিতা করাও যেন একটা বড় প্রতিবাদ । তাই বিনয়কে সে জানিয়ে দিয়েছে –"মেয়েরাও আগে মানুষ , তারপর মেয়ে মানুষ "।[১৩] সমস্ত কথা কমলা বিনয়কে বুঝিয়ে বলতে চায়, বলতে চায় কমলা উপায়হীন নাগরিক জীবন যাত্রার নাগপাশে আবদ্ধ। চাকরির নিয়ম মেনে চলতে হয়। তখনই বিনয়ের ঝোলা থেকে পুরুষ নামক বিড়ালটি বেরিয়ে আসে । বিনয়ের মুখোশ খুলে যায় । বেরিয়ে আসে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা অর্থাৎ বিনয় এতটাই সংকী র্ণমনা ও পরশ্রীকাতর হয়ে পড়ে যে বিয়ে নামক বিষয়টির মধ্যে যে মাধুর্য ও আত্মিক সম্পর্ক থাকার কথা তা কর্পূরের মতো নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিনয় কমলাকে কামনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না।স্বাবলম্বী স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাত্রা তার কাছে ঘোর অপছন্দ হয়ে যায়। সে বলেছে – "না হবে না, বিবাহিতজিবনেরপক্ষে এ একটাঘোরঅনিয়ম, তুমি ও চাকরিছেড়ে দাও"।[১৪]বিনয়ের এই দৈহিক কামনাকে কমলা ঘৃণা করে। নারীর সম্মান যে দিতে জানে না , তার জন্য তার মনে কোন জায়গা নেই । তাই স্বামীর সংসার ত্যাগ করে কুমারীবেশেই চলে আসে বাপের বাড়িতে। কমলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভুল না ঠিক করেছে , তা নিয়ে বিতর্ক চলতেই পারে । কিন্তু দেহ উপভোগের আয়োজন করে দিতে হবে। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে কমলা নিঃসন্দেহে নিজেকে একজন প্রতিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বাংলা সাহিত্য জগতে নারী জীবনের রূপকার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । সমাজের প্রতিটি কোনের নারীর অবস্থা ও দুরবস্থাকে তুলে ধরতে অন্নদাদিদি , অভয়া, সাবিত্রী, কিরণময়ী, কমললতা, রমা প্রভৃতি ব্যক্তিত্বময়ী আত্মমর্যাদাশালী নারী চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে ন। সেই চরিত্রগুলি আত্মমর্যাদায় ব্যক্তিত্বশালী হয়েও সমাজে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার শিকার হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃণাল বিরাজবউ দের মতো নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নারীরা পুরুষশাসিত অনুশাসনে ফিরে আসে না। তারা নিজেদের মতোই গড়ে তোলে নিজস্ব জগত।

পরিশেষে বলা যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "দূরভাষিনী" উপন্যাসটি একাধারে মিলন অন্যধারে ট্রাজেডিশিল্পিত নির্মাণ । নরনারীর প্রেমে পুরুষের উদাসীনতা আর দাম্পত্য জীবনে দায়িত্বহীন পুরুষের অস্বাভাবিক আচরণ জীবনতৃষ্ণা নারীকে বিরূপ করে তুলেছে । কিন্তু স্বনির্ভর স্বাবলম্বী আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তিশীলা নারীকে প্রেম যেন আশ্রয় দেয়নি প্রেম যেমন আশ্রয় দেয়নি তেমনি জীবন সংগ্রামে সংসার বাঁচিয়েও তাকে ঠিকমত আশ্রয় দেয়নি। কমলা ও বীনার ক্ষেত্রে এই পুরুষতন্ত্রের কাঠামোই শেষমেষ কঠোর রূপ ধারণ করে। কমলাকে স্বামীর কিংবা বীণাকে প্রেমিকের কাছে বৈধ পুনর্বাসন ঘটাতে বিংশ শতকীয় সামাজিক আবহে নরেন্দ্রনাথ মিত্র চিত্তশুদ্ধির আয়োজন করেননি । তিনি দক্ষ মনোবিদের মতো নারী জাগরণের ও নারী মনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উন্মোচন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নৈতিক সম্পর্কের ভাঙ্গন কোনদিন জোড়া লাগে না।

**তথ্যসূত্রঃ**

১। নাসরিন তসলিমা, কে দোষীঃwww.http//:M.banglatribune.com/column, বাংলাট্রিবিউন, হোমপেজ, কলামনিউজ, শনিবার, এপ্রিল, ১৫, ২০১৭।

২। মিশ্র অভিজিৎ(সম্পাঃ), 'পদক্ষেপ' নরেন্দ্রনাথ মিত্র জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, বর্ষ-৪২, সংখ্যা – ৪৬, বইমেলাসংকলন, সল্টলেক, কলকাতা – ৯৭, জানুয়ারি – ২০১৬, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ১০৭।
৩। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'উপন্যাস সমগ্র-২', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ০৯, প্রথম সংস্করণ – ২০০৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৩১৯।
৪। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা', মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ২০০৯-১০,পৃষ্ঠাসংখ্যা – ৩৯৮।
৫। মুখোপাধ্যায় অরুণ, 'মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্ন', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩, জানুয়ারি – ২০০২, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ১৫৫।
৬। www.bangla-kobita.com/nazrulislam/nari/
৭। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'উপন্যাস সমগ্র-২', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৫৬।
৮। সিংহ অনিল, 'পশ্চিমবঙ্গের শরনার্থী সমস্যা', ঈশান, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২২।
৯। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'উপন্যাস সমগ্র-২', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৮৮।
১০। মিত্র নরেন্দ্রনাথ, 'উপন্যাস সমগ্র-২', প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৯০।
১১। তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৯৩।
১২। তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৯৬।
১৩। তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৯৬।
১৪। তদেব, পৃষ্ঠাসংখ্যা – ২৯৬।